শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন প্রয়োজন

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০৬

শিক্ষা ও উন্নয়ন একটি অন্যটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। শিক্ষার মাধ্যমেই একটি জাতি উন্নতির সোপানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। শিক্ষা কেবল মানুষের আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনই ঘটায় না। শিক্ষা মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক আর্থসামাজিক উন্নয়নও ঘটায়। তাই শিক্ষাকে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ভাষণে বলেন, 'সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না।' শিক্ষাকে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হিসেবে প্রমাণ করেছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ থিয়োডর শুলজ। তিনি দেখিয়েছেন, সরকারিভাবে যে কোনো সেক্টরে বিনিয়োগের চেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগে দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জিত হয়। শিক্ষায় 'রেট অব রির্টান'-এর বিষয়টি নিয়ে তিনি ১৯৬১ সালে তথ্য-প্রমাণ হাজির করে বিশ্বের প্রতিটি সরকারকে আহ্বান করেছিলেন, তারা যেন তাদের নাগরিকের শিক্ষার পেছনে আরও বেশি করে অর্থ বিনিয়োগ করেন। কিন্তু তার আহ্বানকেই যেন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পরের বছরই তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকার শরীফ কমিশন কর্তৃক শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর প্রতিবাদে রাজপথ কাঁপিয়ে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল এই বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষ। রক্তে রঞ্জিত রাজপথের ওপর দিয়ে প্রতিবাদী জনতার লাশ মাড়িয়ে স্বৈরাচারী সরকার তাদের বাণিজ্যিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি সেদিন। এটি ছিল বাঙালির বিজয়, প্রতিবাদী চেতনার বিজয়। বাঙালির মননে উপ্তস্বপ্নের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিজয় জুগিয়েছিল অনুপ্রেরণা, শানিত করেছিল জাতীয়তাবোধের চেতনা।

পাকিস্তানি সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের মাত্র ৫৪ দিন পর তার এক সময়কার আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তৎকালীন শিক্ষা সচিব এসএম শরীফের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ওই কমিশনের রিপোর্ট ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হলে সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এর কারণ শিক্ষা সংকোচন নীতিসহ দুরভিসন্ধিমূলক বেশকিছু ঘৃণ্য সুপারিশ। এই রিপোর্টে বাংলা ভাষা বাংলা বর্ণমালায় না লিখে আরবি অথবা রোমান বা উর্দু বর্ণমালায় লেখার সুপারিশ করা হয়। একই সঙ্গে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের সুপারিশও করা হয়। এর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অর্জিত ফলকে তারা সুকৌশলে ধূলিসাৎ করার পাঁয়তারা করে। ওই সময় ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষা কোর্স দুই বছরে সমাপ্ত হতো। কিন্তু এই রিপোর্টে ওই কোর্সের মেয়াদ তিন বছর করার সুপারিশ করা হয়Ñ যাতে গরিব ছাত্ররা বাধ্য হয়ে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে রুটিরুজিতে নেমে যায়। এই রিপোর্টের সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি হলো এর বাণিজ্যিকীকরণ চিন্তাচেতনা। এই রিপোর্টে শিক্ষাকে 'অধিকার' হিসেবে না দেখে শিক্ষাকে 'বাণিজ্য' হিসেবে দেখা হয়েছিল। রিপোর্টে 'অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা'কে অসম্ভব বলা হয়। এতে বলা হয়, 'সস্তায় শিক্ষা লাভ করা যায় বলিয়া তাহাদের (জনগণের) যে ভুল ধারণা রহিয়াছে, তাহা শীঘ্রই ত্যাগ করিতে হইবে। যেমন দাম, তেমন জিনিসÑ এই অর্থনৈতিক সত্যকে অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, শিক্ষার ব্যাপারেও তেমনি এড়ানো দুষ্কর। তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা, বস্তুত অবাস্তব কল্পনা মাত্র।' রিপোর্টটিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাÑ সবক্ষেত্রেই বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছিল। এমনকি জাতি যেন উচ্চশিক্ষিত না হয়, এ জন্য রিপোর্টটিতে বলা হয়েছিলÑ 'প্রাথমিক স্কুলই আমাদের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের শিক্ষা জীবনের শেষ সোপান হইবে।' তা ছাড়া রিপোর্টটি ছিল সাম্প্রদায়িকতায় পরিপূর্ণ। এমন শিক্ষা সংকোচনমূলক ও বাজে রিপোর্টটিকে বাংলার জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

advertisement

শরীফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ঢাকা কলেজ থেকে। ডিগ্রি পর্যায়ের ছাত্ররা মেয়াদ বৃদ্ধিকে মেনে নিতে না পারায় আন্দোলনে নেমে পড়ে। তাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ, কায়েদে আযম কলেজের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজ) ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সবাই মিলে 'ডিগ্রি স্টুডেন্ট ফোরাম' নামে একটি ব্যানারে আন্দোলন গড়ে তোলে। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে এই ব্যানারে আন্দোলন, মিছিল, সভা, সমাবেশ, ধর্মঘট চলছিল। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো সমন্বিতভাবে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। তারা শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলসহ মোট ১১ দফা দাবি আদায়ের ঘোষণা দেয় ২ আগস্ট। দাবি আদায়ের জন্য ১৫ আগস্ট সারাদেশে ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান করে। সেদিনের অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে পাকিস্তানি সামরিক শাসক। তারা নির্র্যাতন শুরু করে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর। এতে ছাত্ররা দমে না গিয়ে আরও শতগুণবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলন, প্রতিবাদ-বিক্ষোভে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেন ছাত্রদের নানা দিকনির্দেশনা দিয়ে। ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিন। ছাত্রদের লড়াকু মনোভাব দেখে স্বৈরাচারী সরকার ১০ সেপ্টেম্বরের ডাকা অবস্থান ধর্মঘটের স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ছাত্ররা অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাখ্যান করে নিয়েছিল সেদিন। কিন্তু তাদের দাবি মানা হয়নি। একদিকে সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, অন্যদিকে চাপিয়ে দেওয়া গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল ও গণমুখী শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৭ সেপ্টেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সারাদেশে হরতাল ঘোষণা করেছিল।

ওইদিন সকাল ১০টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনের দিক থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলে হাজারো মানুষ অংশ নেয়। ছাত্রদের আন্দোলন হলেও দেখা যায় ওই মিছিলে মেহনতি মানুষের উপস্থিতি ছিল ৯৫ শতাংশেরও বেশি। দিনমজুর, গৃহশ্রমিক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ ছাত্রদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মিছিলে জমায়েত হয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সামরিক শাসন ও তাদের নির্মম শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। স্লোগানে স্লোগনে মুখরিত হয়ে গিয়েছিল পুরো ক্যাম্পাস। মিছিল শুরু হয়ে নবাবপুরের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ হাইকোর্টের সামনে বাধা দেয়। তখন মিছিলকারীরা সংঘাতে না গিয়ে আবদুল গনি রোডের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ মিছিলের পেছন থেকে লাঠিচার্জ, কাঁদানি গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে ছাত্র বাবুল, বাস কন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা ও গৃহকর্মী ওয়াজিউল্লাহ নিহত হন। পুলিশের এই আক্রমণের প্রতিবাদে সারাদেশই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, রাজপথ হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র। টঙ্গিতে শ্রমিক সুন্দর আলী নিহত হন। আর সারাদেশে আহত হন হাজারেরও বেশি মানুষ। ছাত্র, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণের অভূতপূর্ব ওই আন্দোলন আইয়ুর খানের সামরিক শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন। ওইদিনের হরতাল ছিল আইয়ুব খানের আমলের প্রথম হরতাল। এই হরতাল

সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল ছাত্র-জনতার মেলবন্ধনের কারণে, প্রতিবাদী চেতনার কারণে। সেদিন সন্ধ্যায় প্রতিবাদী ছাত্ররা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে গেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে তাকে বলেছিলেন, 'স্যার, এরা লড়াই করছে, গুলি খাচ্ছে আর আমরা ঘরে বসে বিবৃতি দিচ্ছি। এদের সেন্টিমেন্টকে তো বুঝতে হবে।' অতঃপর সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে তৎকালীন পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুকের সঙ্গে বৈঠক করেন। সামরিক সরকার বাধ্য হয়ে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের কাজ স্থগিত ঘোষণা করে। এটি ছিল বাঙালির বিজয়। এই বিজয় বাঙালিকে স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শিক্ষার অধিকারকে সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদেই কেবল অন্তর্ভুক্ত করেননি, প্রাথমকি বিদ্যালয় জাতীয়করণসহ শিক্ষার উন্নয়নে অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শরীফ কমিশনের সংকোচন নীতি থেকে বেরিয়ে এসে গণমুখী শিক্ষা কমিশন গঠন করেন ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে। ওই কমিশন স্বাধীন দেশের উপযোগী আধুনিক ও গণমুখী এবং বাস্তবায়নযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতের পর অন্যসব কিছুর মতোই শিক্ষাব্যবস্থাও উল্টোরথে যাত্রা শুরু করে। জাতি নিমজ্জিত হয় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। '৭৫-পরবর্তী প্রতিটি সরকার 'টাকা যার শিক্ষা তার'Ñ এই নীতির বাস্তবায়ন করে শরীফ কমিশনের সুপারিশই যেন বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালিয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সরকার শরীফ কমিশনের অপছায়া থেকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করেছেন। শিক্ষাকে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে তিনি একের পর এক স্কুল, কলেজ জাতীয়করণ করছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করছেন। শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমসহ নানা প্রণোদনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। ফলে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণের হার পৌঁছেছে কাঙ্ক্ষিক্ষত পর্যায়ে। কিন্তু এখন শিক্ষার সংখ্যাগত প্রবৃদ্ধির চেয়ে গুণগত শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সবাই শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য যদি একযোগে কাজ করেন, তা হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত বিশে^র কাতারে পৌঁছানোর যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছেÑ সেটি অর্জিত হবে।

য় বাহালুল মজনুন চুন্নু : সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ